ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1556-1573
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.377

শৈলী চিন্তার আলোকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস: 'পাতাল ঘর'

ড. সবিতা বিশ্বাস, *স্বাধীন গবেষক, শিলচর, অসম, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article examines the stylistic features of Shirshendu Mukhopadhyay's juvenile novel Patal Ghar through the lens of stylistics. Style, as a manifestation of an author's individuality, reflects distinctive linguistic choices in terms of diction, syntax, and narrative technique. Drawing upon theoretical perspectives from scholars such as Arun Kumar Mukhopadhyay and Pabitra Sarkar, the study highlights how stylistics serves as a scientific method for analyzing literary language.

The paper contextualizes children's and adolescent literature in Bengali literary tradition before focusing on the stylistic traits of Patal Ghar. It identifies key features such as the predominance of short and simple sentences, along with the use of complex, compound, and mixed sentence structures. The narrative also employs T-units, incomplete sentences, and conversational language to maintain accessibility and engagement for young readers.

Further, the study explores the use of verbs (including impersonal and compound forms), onomatopoeic expressions, reduplication, slang, and code-switching as integral stylistic devices. The novel's discourse structure alternates between descriptive and dialogic modes, enhancing narrative dynamism. Additionally, figures of speech like imagery and simile contribute to vivid visualization and emotional resonance.

Overall, the article argues that Mukhopadhyay's stylistic craftsmanship— marked by simplicity, variety, and expressive richness— effectively caters to the cognitive and imaginative world of adolescent readers, establishing him as a significant figure in Bengali juvenile fiction.

Keywords: Stylistics, Juvenile Literature, Narrative Style, Bengali Fiction, Language and Expression

কবি বা লেখকের নিজস্ব ভাবনারাজির সুললিত ভাষিক উপস্থাপন হলো শৈলী। যার মাধ্যমে একজন লেখক অন্যান্য লেখকের লেখা থেকে নিজের লেখাকে স্বতন্ত্র রূপে পাঠকের সন্মুখে তুলে ধরতে পারে। পক্ষান্তরে শৈলী কেবল একজন লেখকের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই নয় বরং সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিকে নান্দনিক ও সাবলীল করে তুলতে সাহায্য করে। বিস্তৃত অর্থে শৈলী কথ্য এবং লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। শৈলী শব্দটি ইংরেজি স্টাইল শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ। বিশিষ্ট শৈলী চিন্তক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় শৈলীর সংজ্ঞা প্রদানে বলেছেন-

> "যে কোনো গদ্য রচনা বা কবিতায় লেখকের ব্যক্তিত্বের এমন সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায় না। অথচ অনুভব করা যায়। এবং সেই সব গুণ এর যোগফল লখক ব্যক্তিত্ব, এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাকে এককথায় বলা যায় স্টাইল।"[১]

অর্থাৎ শৈলী হলো লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তার ফসল। এই কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তির বলার কৌশল যেমন আলাদা তেমনি প্রত্যেক লেখকের লেখার কৌশলও আলাদা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের মতে-

> "প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব রচনালক্ষণ কিছু আছে। ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, প্যারাগ্রাফ বা স্তবক রচনা, রচনার আরম্ভ ও উপসংহার-ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই সেই লক্ষণগুলি ধরা পড়ে।"[২]

আর এর জন্যই একজন লেখককে অন্য একজন লেখকের থেকে পৃথক করে তোলে। একজন লেখক তাঁর রচনায় শব্দ তাত্ত্বিক, ব্যাকরণিক, চিত্রকল্প, ভাষা, ছন্দ-অলংকার, বাক্য প্রয়োগ বৈচিত্র প্রভৃতি বিষয় গুলি যে কৌশলের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে শৈলীবিজ্ঞান। শৈলীবিজ্ঞান ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত হয়েও সতন্ত্ররূপে বিরাজিত। শৈলীবিজ্ঞানী জিওফ্রে লীচ শৈলীবিজ্ঞানে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "Style is a relational term: we talk about 'the style of 'x' referring through 'style' to characteristics of language use, and correlating these with some extralinguistic x, which we may call the stylistic domain."[৩]

অর্থাৎ শৈলী হল ভাষা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি শব্দ। ইউরোপের মার্কিন দেশে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে শৈলীবিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছিল। এ সময়ে Stylistics বা শৈলী বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন- এরিক ইঙ্কভিস্ট, পলপারভিন, সেমুর চ্যাটম্যান, স্টিফেন উলম্যান, এম.এ. কে হ্যালিডে, ডোনাল্ড সি.ফ্রিম্যান, জে.এম.সি.এইচ. সিনচেয়ার, জে.পি. থর্ন, মাইকেল হোয়ে, স্যামুয়েল লাভিন, রিচার্ড ওম্যান, জিওফ্রে লীচ, এইচ.জি উইডোসন প্রমূখ। তাঁদের আলোচনার পথ ধরেই পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় শৈলীবিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাভাবনার সুত্রপাত ঘটে। বাংলায় শিশির কুমার দাস তাঁর 'Early Bengali prose' (১৯৬৬) গ্রন্থের মধ্যে প্রথম শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে অরুণ কুমার বসু সম্পাদিত 'বাংলা গদ্যে শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৮১), আশীষ কুমার দে-র 'উপন্যাসের শৈলী' (১৯৮৩), পবিত্র সরকারের 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি' (১৯৮৫), অপূর্ব রায়ের 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৮৯), অভিজিৎ মজুমদারের 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্য তত্ত্ব (২০০৭), গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'শৈলী বিজ্ঞান পরিচিতি' প্রভৃতি গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞান নিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

শৈলীবিজ্ঞান সাহিত্যের ভাষা বিচার-বিশ্লেষণ করার গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কোন একটা পাঠকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য, শব্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য, পদ ও পদগুচ্ছের ব্যাকরণিক বিশিষ্টতা, ছন্দ, অলঙ্কার , চিত্রকল্প রূপায়নের বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি নির্ণয়ের স্বরূপ ব্যক্ত করা ও লেখকের নিজস্ব চিন্তাভাবনার কৌশল তুলে ধরা শৈলী বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। লেখকের শব্দ চয়ন, পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Stylistics) এবং বাক্য ও বাক্যাংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় পদ্ধতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা শৈলীবিজ্ঞানের একটি বিচার্য বিষয়। উল্লেখ্য প্রবন্ধে আমাদের আলোচিত বিষয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোরদের জন্য রচিত 'পাতাল ঘর' উপন্যাসের শৈলী। এর পূর্বে শিশু-কিশোর সাহিত্য ও শিশু কিশোর সাহিত্যের শৈলী সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারী জীবনের মতই শিশু-কিশোরদের 'জীবনরহস্য' দীর্ঘকাল যাবত অবহেলিত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থেকেছে। ক্ষমতার দ্বারা নির্মিত সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতাসীনরা ও 'প্রাপ্তবয়স্ক'রা মনে করেন শিশু-কিশোরদের তাঁরা তাঁদের তৈরি করে দেওয়ার নিয়ম কানুনের কাঠামোতে আবদ্ধ রাখবেন। সেই ভাবনা অনুযায়ীই সাহিত্যেকরাও শিশু-কিশোরদের আদর্শ জীবন গড়ে তোলার অভীপ্সাতে শিশু-কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছেন ও এই দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। শিশু-কিশোরদের নিয়ে তাঁদের মনে নানা প্রশ্ন জাগতে থাকে। শিশু-কিশোরদের অবলম্বন করে বিভিন্ন তত্ত্ব গড়ে উঠতে থাকে। প্রথমদিকে শিশু কিশোর সাহিত্যের উৎস ছিল কল্পলোক, কিংবদন্তি এবং পৌরাণিক উপাদান সমূহ। ধীরে ধীরে শিশু-কিশোর ভিত্তিক সাহিত্যে কল্পলোকের পাশাপাশি বাস্তব অনুভূতির ছোঁয়া লেগেছে। শিশু-কিশোর সাহিত্যের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। লীলা মজুমদার শিশু-কিশোর সাহিত্য বলতে পাঁচ থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সাহিত্যকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

> "ইংরেজিতে যখন বলা হয় বুকস্ ফর চিল্ড্রেন, কিংবা জুভেনাইল লিটারেচার, সকলেই বুঝে নেয়, ঐসব বই ৫ থেকে ১৬ পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা অর্থাৎ স্কুলের ছেলে মেয়েরা পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে শিশু সাহিত্য বাদে ঐ অর্থে ব্যবহার করলে কেউ কেউ আপত্তি করেন, বলেন ৮-৯ বছরের পর কেউ শিশু থাকে না, হয়ে ওঠে কিশোর। যদিও শিশুদের জন্য আর কিশোরদের জন্য দু'রকম বই লেখা হয়, সুবিধার জন্য আমরা শিশু সাহিত্য বলতে ৫ থেকে ১৬ পর্যন্ত পাঠকদের মনে করি।"[৪]

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে বিদ্যালয়ের পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত সাহিত্যই শিশু-কিশোর সাহিত্য। সহজ ভাষায় বলা যায় শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্যই শিশু-কিশোর সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্য ধারায় শিশুসাহিত্য ও কিশোর সাহিত্যের মধ্যেও আংশিক পার্থক্য রয়েছে। এই দুটি ধারার কিছুটা পার্থক্য থাকলেও বাংলায় দুটি ধারাই একই সঙ্গে আলোচিত। অনেক সময় দেখা যায় কিশোর পাঠকরা শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্যের মধ্যেও নিজেদের আনন্দ অনুভূতি খুঁজে নেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির বই, ছোটদের রামায়ণ, সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল, বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি শিশুসাহিত্যের সীমা পেরিয়ে কিশোর সমাজেও সমাদৃত। অনুরূপভাবেই প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য রচিত বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাসটিও কিশোরদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিদ্যা ও সাহিত্যের পাঠ চালু করার মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়েছিল। ১৮১৮ সালে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'নীতিকথা' নামক গ্রন্থটিকে প্রথম বাংলা শিশু-কিশোর পাঠ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে রচিত গ্রন্থ গুলোর উদ্দেশ্য ছিল নীতি শিক্ষা। বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয় কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রমূখরাও যে বই গুলো রচনা করেছিলেন সেগুলোও ছিল উপদেশধর্মী ও নীতিকথা মূলক। বিদ্যাসাগরের পরে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই শিশু কিশোর সাহিত্যের সার্থক রূপায়ন শুরু হয়। গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটক প্রভৃতি সকল সাহিত্য ধারাতেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। ১৮৮১ সালে 'বাল্মিকী প্রতিভা', ১৮৮২ সালে 'কালমৃগয়া' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সৃষ্টি।

পরবর্তীতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছেন। তাঁর রচিত প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের আরেকজন অন্যতম প্রতিভাবান রচনাকার হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি'

(১৯০৬), 'ঠানদিদির থলে' (১৯১৩), 'ঠাকুরদার ঝুলি' (১৯০৯), 'দাদা মশাই এর থলে' (১৯১৩) প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম সৃষ্টি।

বাংলা ভাষায় মৌলিক শিশু কিশোর সাহিত্যের সূচনা হয় 'বালক বন্ধু' (১৮৭৮) প্রকাশিত হওয়ার পর। এই পত্রিকাটি কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এরপর প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' (১৮৮৩), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' (১৮৮৫), ভুবন মোহন রায়ের 'সখা ও সাথী' (১৮৯৩), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' (১৮৯৫), 'প্রীতি' পত্রিকাগুলি শিশু কিশোর সাহিত্যের পথ আরো সুগম করে তুলেছিল। 'সখা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক কিশোরপাঠ্য গ্রন্থ প্রমদাচরণ সেনের 'ভীমের কপাল' প্রকাশিত হয়। এই পত্র-পত্রিকাগুলো কে কেন্দ্র করে বহু লেখক শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনা করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ভুবন মোহন রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, নারায়ণ সান্যাল, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ সেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকার লাবণ্যপ্রভা বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা এই ধারায় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যোগীন্দ্রনাথের 'সাত ভাই চম্পা', 'ভুলো ও বাঘা', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' (১৮৯৩) নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'শিশু রঞ্জন রামায়ণ' (১৮৮১), 'আমার খুকু', 'মজার পড়া', 'সোনামনির রাগ', 'ক্ষীরের পুতুল', প্রমোদাচরণ সেনের 'কেরানি পাখি' প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি শিশু-কিশোর সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থ গুলি বাক্যবিন্যাস রীতিতে শিশু-কিশোরদের লেখন বিশ্বে একটা নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে 'সন্দেশ' (১৯১৩) 'মৌচাক' (১৯২০), 'শিশু ও সাথী' (১৯২২), 'রঙ মশাল' (১৯০৭), 'রামধনু' (১৯২৭), 'মাস পয়লা' (১৯২৯) ইত্যাদি পত্রিকাগুলি বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের জগতে চমক নিয়ে এসেছিল। এই সব পত্রিকায় রূপকথার পরিবর্তে অ্যাডভেঞ্চার , গোয়েন্দা কাহিনি, কল্পবিজ্ঞান , ছোটগল্প প্রভৃতি নতুন ভাবে উঠে আসে। ফলে এই ধরনের গ্রন্থগুলি শিশু-কিশোরদের মনে অনায়াসেই জায়গা করে নেয়। সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার, শিব্রাম চক্রবর্তী প্রভৃতি লেখকেরা এই ধারার অন্যতম পথিকৃৎ। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু', 'ঝালাপালা', 'লক্ষণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'শব্দ কল্প দ্রুম', 'হ-য-ব-র-ল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি কিশোর সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সুকুমার রায়ের ভাষা চয়ন, 'শব্দ ব্যবহার, বাক্য গঠনের কৌশল সবই শিশু-কিশোরদের মনকে হাস্যরসে ভরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তাছাড়াও ক্ষিতিন্দ্র নারায়ন ভট্টাচার্য, নজরুল, কুলদা রঞ্জন, বন্দে আলী মিয়া, বিমল ঘোষ, ধীরেন্দ্রলাল ধর, অখিল নিয়োগী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন, গিরীন্দ্রশেখর বসু, সত্যজিৎ রায় প্রমূখ সাহিত্যিকদের রচনা শিশু কিশোর সাহিত্যের সার্থক রূপায়নে ঘটেছে।

সত্যজিৎ রায়ের পর বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য তুলনামুলক ভাবে কম রচিত হয়েছে। সত্তরের দশকে 'আনন্দমেলা' পত্রিকা কে অবলম্বন করে শিশু-কিশোর সাহিত্য আবার পুরনো রূপে ফিরে আসে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসমগ্রের 'ভয়ঙ্কর সুন্দর', 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক', 'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'খালি পাহাড়ের রহস্য' প্রভৃতি কিশোর উপন্যাস গুলি শিশু-কিশোরদের মন জয় করে। ষষ্ঠী চরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'পান্ডব গোয়েন্দা' সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'মিতিনমাসি সমগ্র' প্রভৃতি বাংলা কিশোর উপন্যাসের জগতে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই ধারারই একজন অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক হলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা হলেও শিশু-কিশোর উপন্যাসে শৈলী নিয়ে আলোচনা অপ্রতুল। শিশু-কিশোর সাহিত্যের শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হল ডেভিড হারম্যান (১৯৯৪), সি.সি আন্ডারসন (১৯৪৫), হান্ট পিটার (১৯৯৭) জনেসা (২০১২), রবার্ট লুই (?), পেডিকর্ড মেরি হিল (২০০০) প্রমূখ। তাঁরা শিশু-কিশোর সাহিত্যে শৈলী নিয়ে যে

গ্রন্থগুলিতে আলোচনা করেছেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল- মেরী হিল পেডিকর্ডের 'Linguistic Stylistics and Children's literature', জঁ গুটেরি'র 'Style in Children's Literature', পিটার হান্টের 'Understanding Children's literature', জন স্টিফেনের 'Analysing Text for Children: Linguistics and Stylistics', প্রভৃতি।

Celia catlett Anderson তাঁর 'Style in children literature: a comparison of passage' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে কিশোরসাহিত্য কে চিহ্নিত করার জন্য শৈলীগত কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন-

- ছোট ছোট বাক্যের অধিক ব্যবহার থাকবে।
- টি-ইউনিট এর ব্যবহার থাকবে।
- খন্ড বাক্য বা অসম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার থাকবে।
- শব্দগত পুনরাবৃত্তির ব্যবহার থাকবে।
- বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত হবে।
- কিশোর উপন্যাস লেখার সময় উপন্যাসিক মৌখিক ঐতিহ্য থেকে কাহিনী গ্রহণ করেন।

Perry Nodelman তাঁর 'The hidden adult defining children's literature' (2008) গ্রন্থে শিশু সাহিত্য কে চিহ্নিত করার জন্য শৈলীগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন-

- শিশু-কিশোরদের বই সাধারণত সংক্ষিপ্ত হবে।
- বর্ণনা এবং অন্তর্নিহিত করণ এর পরিবর্তে একটি সংলাপ বা ঘটনার উপর বেশি জোর দিতে হবে।
- শিশু-কিশোরা আখ্যানের প্রধান চরিত্র হবে এবং শিশু-কিশোর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বেশি ব্যবহৃত হবে।
- শিশুদের বই এর মধ্যে বিষন্নতার পরিবর্তে আশাবাদী মনোভঙ্গি থাকবে।
- বয়ানের ভাষা হবে শিশু অনুসারী।
- বয়ানে অবিরাম জাদু কথা বলা কল্পনা প্রবণতা বেশি থাকবে।

Laina Ho তাঁর 'Children Literature in Education' (2000, Vol. 31) কিশোর সাহিত্য কে চিহ্নিত করার জন্য শৈলীগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন-

- অনুপ্রাস এর ব্যবহার থাকবে।
- ধনাত্মক শব্দের ব্যবহার থাকবে।
- স্বরের সাদৃশ্য থাকবে।
- অতিশয়োক্তির প্রয়োগ থাকবে।
- ছন্দ ও লয় থাকবে।
- কবিতায় শব্দ বা চরণের শেষে অন্তমিল থাকবে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখেও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসের বিশ্লেষণ করা যায়।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ছোট ছোট বাক্য বা সরল বাক্যের ব্যবহার:

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ছোট ছোট বাক্য বা সরল বাক্য প্রয়োগ করে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মতোই তাঁর কিশোর উপন্যাসে বাক্য গুলির দৈর্ঘ্যে ছোট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি কর্তৃপদ, ও একটি ক্রিয়াপদ বা দুই-তিনটি বিশেষণ পদের দ্বারা সরল বাক্য রচনা করেছেন। বাক্য প্রয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখের ভাষা প্রয়োগ করে নিজস্বতা ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন-

> "ভূতের দাম আছে দেখছি।" (পৃ-১৭৭)
> "সুবুদ্ধি এতক্ষণ বড় অস্বস্তি বোধ করছিল।" (পৃ-১৭৯)
> "বাড়িটাও কেনা হয়ে গেল। এখন একটু মেরামত করে নিলেই হয়।" (পৃ-১৮০)

কিশোর উপন্যাস মানেই যে শুধুমাত্র ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট শব্দাবলী, কাব্য গুণান্বিত বর্ণনা থাকতে হবে এই ভাবনায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বিশ্বাসী নন। তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ছোট ছোট বাক্য বা সরল বাক্যের পাশাপাশি জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য ও যৌগিক মিশ্র বাক্যের ব্যবহার করেছেন।

'পাতালঘর' উপন্যাসে জটিল বাক্যের ব্যবহার:

কিশোর উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে জটিল বাক্য নির্বাচনের একাধিক উদ্দেশ্য হতে পারে। বহুবিধ কাহিনির মধ্যে সংযোগের বন্ধন দৃঢ় করতে এবং উপন্যাসের সামগ্রিকতা ও অখন্ডতা যাতে বিনষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ রেখেই লেখক কিশোর উপন্যাসে জটিল বাক্যের ব্যবহার করেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিশোর উপন্যাসে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে জটিল বাক্য গুলি ব্যবহার করেন। যেমন-

> "আর যতই হামলে পড়ছে ততই ভূতেরা গা-ঢাকা দিচ্ছে।" (পৃ-১৭৮)
> "সমাজ মিত্তিরের গলায় যে এতো জোর, তা তাদের জানা ছিল না।" (পৃ-১৯৫)

'পাতার ঘর' উপন্যাসে যৌগিক বাক্যের ব্যবহার:

এক বা একাধিক সরল বাক্য বা জটিল বাক্য পাশাপাশি বসে অর্থ ও গঠন অপরিবর্তিত রেখে সংযোজক অব্যয় এর দ্বারা একত্রিত হয়ে বাক্য নির্মাণ করে তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় উপন্যাসে সরল বাক্য ও জটিল বাক্যের পাশাপাশি যৌগিক বাক্যের ব্যবহার আখ্যানের বক্তব্যকে গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলেছে। তাঁর কিশোরদের জন্য লিখিত উপন্যাস থেকে উদাহরণ নিয়ে যৌগিক বাক্যের বিষয়টি স্পষ্ট করা হল।

> "মিলিটারিতে খাইখরচ লাগে না, পোশাক-আশাকও বিশেষ লাগে না, ইউনিফর্ম তো সরকার দেয়।" (পৃ-১৭৯)
> "অন্ধকার এবং অজানা প্রতিপক্ষ সামনে থাকলে একটু কৌশল নিতেই হয়।" (পৃ-২০০)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে যৌগিক মিশ্র বাক্যের ব্যবহার:

> "প্রথমটায় পাথর বলে মনে হলেও আরো কিছু মাটি খসাবার পর দরজায় যেমন লোহার কড়া লাগানো থাকে তেমনই একটা মস্ত এবং ভারী কড়া হাতে পেল।" (পৃ-২০১)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পাতাল ঘর উপন্যাস থেকে সংগৃহিত প্রথম দুশো (২০০) বাক্য নিয়ে বাক্য বিন্যাসের (সরল বাক্য, জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য, যৌগিক মিশ্র বাক্য) শতকরা পরিমাপ নিম্নে সংগঠন চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল-

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে বাক্যের সংগঠন চিত্র:

উপন্যাস	মোট গৃহীত বাক্য সংখ্যা	সরল বাক্যের সংখ্যা (%)	জটিল বাক্যের সংখ্যা (%)	যৌগিক বাক্যের সংখ্যা (%)	যৌগিক মিশ্র বাক্যের সংখ্যা (%)
পাতাল ঘর	২০০	১১৩ (৫৬.৫%)	৩৮ (১৯%)	৪৩ (২১.৫%)	৬ (৩%)

উপরের এই সংগঠন চিত্র থেকে বোঝা যায় সে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তার 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য, ও মিশ্র বাক্যের তুলনায় সরল বাক্য বেশি ব্যবহার করেছেন।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সাকাঙ্ক্ষ বাক্যের ব্যবহার:

কোনো একটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে বোঝার জন্য একটি পদ শোনার পর অন্যপদটি শোনার যে ইচ্ছে প্রকাশ পায়, তাই হল আকাঙ্ক্ষা। যেমন- 'সামনে পুকুর' এই বাক্যটির দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়না। 'সামনে পুকুর' শোনার পর আরও কিছু শোনার আগ্রহ তৈরী হয়। সামনে পুকুর আছে বা সামনে পুকুর ছিল, তা স্পষ্ট নয়। এখানে বাক্যটির উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না তাই বাক্যটি সাকাঙ্ক্ষ বাক্য। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সাকাঙ্ক্ষ বাক্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যথা-

> "বড় গঞ্জ, মেলা লোকজনের যাতায়াত।" (পৃ-১৭৯)
> "পেছনে একটা মজা পুকুর।" (পৃ-১৮৮)
> "সাপ-খোপ আর তক্ষকের বাসা।" (পৃ-২২৪)

উপরের বাক্যগুলিতে প্রথম বাক্যে লোকজনের যাতায়াত আছে কি নেই তা শোনার আগ্রহ থেকে যায়, দ্বিতীয় বাক্যে মজা পুকুর আছে কি নেই তা স্পষ্ট নয়, তৃতীয় বাক্যে সাপ-খোপ তক্ষকের বাসা আছে কি নেই তা শোনার আগ্রহ প্রকাশ পায়। সুতরাং এই বাক্যগুলো সাকাঙ্ক্ষ বাক্য

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের বিশেষত্ব:

বাক্যের মধ্যে অবস্থিত যে পদের দ্বারা কোন ক্রিয়া বা কাজ করা বোঝায় তাই হল ক্রিয়া। ক্রিয়াপদের মূলে রয়েছে ধাতু। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে। সুকুমার সেনের ভাষায়-

> "যে মূল অংশে কাল ও ভাববাচক, বচন ও পুরুষ বাচক এবং বিভিন্ন অসমাপিকা অর্থবাচক বিকরণ ও বিভক্তি যোগ করিয়া সমাপিকা ও অসমাপিকা পদ নিষ্পন্ন হয়- তাহাকে বলে ধাতু অর্থাৎ ক্রিয়া ধাতু (root)।"[৫]

অর্থাৎ ধাতু হলো ক্রিয়ার মূল অংশ। ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে পদ সৃষ্টি হয় এবং যে পদের দ্বারা থাকা, খাওয়া, আসা-যাওয়া, প্রভৃতি কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

অর্থ ও ভাবের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। (১) সমাপিকা ক্রিয়া (২) অসমাপিকা ক্রিয়া। এছাড়াও আরও চার প্রকার ক্রিয়াপদ রয়েছে। যেমন- (৩) অকর্তৃক ক্রিয়া (Impersonal verb) (৪) যৌগিক ক্রিয়া (Compound verb) (৫) নিজন্ত ক্রিয়া (Causative verb) (৬) অসম্পূর্ণ ক্রিয়া (Effective verb)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তার 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের পাশাপাশি ক্রিয়া অকর্তৃক ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়া প্রয়োগ করে ক্রিয়াশ্রয়ী শৈলীর বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

অকর্তৃক ক্রিয়ার ব্যবহার:

বাংলা ব্যাকরণে যে ক্রিয়াপদের কোনো কর্তা থাকে না তাকে অকর্তৃক ক্রিয়া বা কর্তাবিহীন ক্রিয়া বলে। বাংলা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে যে ক্রিয়াপদের এক বা একাধিক কর্তা থাকে সেইসব ক্রিয়াপদ থেকে পৃথক অর্থাৎ এই পদটি একটি কর্তা কিংবা দ্বিকর্তৃক ক্রিয়া থেকে আলাদা একটি পদ। ক্রিয়াপদের এই ধর্মকে অকর্তৃত্ব বলে। কে বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে অকর্তৃক ক্রিয়া যুক্ত বাক্যের কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। গল্প-উপন্যাসে বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে অকর্তৃক ক্রিয়ার ব্যবহার লেখকের বিশিষ্ট শৈলী ভাবনাকে প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে বাক্যের মধ্যে কর্তাকে অনুপস্থিত রেখে বাক্যের কার্য সম্পাদন করেন। অকৃর্তক ক্রিয়া যুক্ত

বাক্যে কর্তৃকারকের বিভক্তি লোভ পায় এবং সম্বন্ধ পদের বিভক্তি যুক্ত হয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে অকর্তৃক ক্রিয়ার ব্যবহার করে ক্রিয়াশ্রয়ী শৈলীর পরিচয় দিয়েছেন। যেমন-

> "একডাকে সবাই চেনে।" (পৃ-১৮১)
> "খাঁজ ভেঙে মাটির চাপড়া খসে পড়ে গেল।" (পৃ-২০১)
> "তারপর হাত ছেড়ে দিতেই দড়াম করে পড়ল নীচে একটা বাঁধানো জায়গায়।" (পৃ-২০৩)

এখানে প্রথম দৃষ্টান্তে ক্রিয়াপদ হল একডাকে চেনে। কাকে একডাকে চেনে তা উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে খসে পড়ে গেল হল ক্রিয়াপদ। এখানে কে খসে পড়ল তা উল্লেখ নেই। তৃতীয় দৃষ্টান্তে ক্রিয়াপদ হল দড়াম করে পড়ল, এখানে কে পড়ল তার উল্লেখ নেই। সুতরাং এই বাক্যগুলো কর্তাবিহীন বাক্য।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার:

যে ক্রিয়াপদে একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে অপর একটি ক্রিয়ার পরিণতি জানা যায় বা একের অধিক ক্রিয়ার সাহায্যে একটি পদ গঠিত হয় তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। সুকুমার সেন যৌগিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা প্রদানে বলেছেন-

> "কোনো ক্রিয়া অন্য পদের যোগে একটিমাত্র অর্থ প্রকাশ করিলে যৌগিক ক্রিয়া বা ধাতু বলে।"[৬]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়-

> "সুবুদ্ধি একটু ভেবে তার লাঠিটাও নিয়ে নিল।" (পৃ-১৯৯)
> "তারপর সরু একটা ফালি ফোকর উন্মোচিত হয়ে গেল সুবুদ্ধির সামনে।" (পৃ-২০৩)
> "সেএকটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল।" (পৃ-২২৫)

এখানে বাক্য গুলিতে ব্যবহৃত নিয়ে নিল, হয়ে গেল, বেরিয়ে এল ইত্যাদি পদ গুলি যৌগিক ক্রিয়া।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে অসম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার:

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসে গদ্যরীতির আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো অসম্পূর্ণ বাক্যের মধ্যে দিয়ে ভাব ব্যক্ত করা। তাঁর কিশোর উপন্যাসে অসম্পূর্ণ বাক্যের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়-

> "এটাই কি..." (পৃ-২০০)
> "তাঁর ছিল পাঁচ ছেলে..." (পৃ-২১৬)
> "তবে একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে কিনা, তাই বলছিলুম...।" (পৃ-২১৭)
> "আজ্ঞে আপনার ঘুমটা একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে কিনা, তাই..." (পৃ-২১৭)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে 'টি-ইউনিট' এর ব্যবহার:

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস রচনার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল টি- ইউনিট এর ব্যবহার। টি-ইউনিট হল খণ্ডবাক্য। Celia Catlett Anderson তাঁর 'Style in children literature a comparison a passage' গ্রন্থে শিশু-কিশোর সাহিত্যকে চিহ্নিত করার জন্য শৈলীগত যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছেন তার মধ্যে টি-ইউনিটের ব্যবহার একটি বিশেষ দিক। ভাষাবিজ্ঞানের শাখায় ১৯৬৫ সালে ভাষাবিজ্ঞানী কেলোগ হান্ট প্রথম 'টি-ইউনিট' শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর 'Grammatical Structures Written at Three Grade Levels' এ 'টি-ইউনিট' সম্পর্কে বলেন- 'টি-ইউনিট' হল বাক্য গঠন সংক্রান্ত বিকাশ পরিমাপের মানদন্ড। শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাক্যের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। টি-ইউনিট বাক্য গঠনের এই মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় খুব অল্প বয়সের শিশুরাও যৌগিক বাক্য ব্যবহার করে দীর্ঘ বাক্য লেখে, যার ফলে প্রতিটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ সংখ্যার মান

নির্ধারণ করা যায় না, এরকম পরিস্থিতিতে কেলোগ হান্টের টি ইউনিট যথেষ্ট কার্যকরী। তিনি প্রতিটি মেইন ক্লজের গড় শব্দ সংখ্যা নির্ধারণ করে দেন। মেইন ক্লজ এর ব্যাখ্যা যেহেতু সময় বিশেষে আলাদা আলাদা হয় সেহেতু তিনি একে 'Minimally terminable unit' নামে আখ্যায়িত করেন। এটি ব্যাকরণগতভাবে অনুমোদিত সংক্ষিপ্ততম বাক্য। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে টি-ইউনিটের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়-

> "এক লাখ।" (পৃ-১৮০)
> "যে আজ্ঞে।" (পৃ-১৮১)
> "তোর মাথা।" (পৃ-১৮২)
> "দূর পাগলা।" (পৃ-১৮৭)
> "ভূল হচ্ছে।" (পৃ-১৯২)
> "নরম মাটি।" (পৃ-২০১)
> "আজ্ঞে সাংঘাতিক।" (পৃ-২১৭)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার:

শৈলীর আলোচনায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ বিশ্লেষণ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যারা কিশোর উপন্যাসের শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা বলেছেন যে কিশোর উপন্যাসের একটি শৈলীগত বৈশিষ্ট্য হল ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার। ধ্বন্যাত্মক শব্দ একাধিক ধ্বনির সংযোজন। এই ধ্বনি সংযোজন একদিকে যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুকৃতি অন্যদিকে ব্যঞ্জনাত্বক অনুভূতির প্রতীক।

> "নৈসর্গিক ধ্বনি মানুষ যেভাবে শোনে তার ভাষায় বর্ণ ও ধ্বনির মামে সেই ভাবে ব্যক্ত করে। সেই অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ ভাষায় বর্ণ বা ধ্বনি গুলির নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতি বা ব্যঞ্জনারপে অন্যদিকে সইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতির প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।"[৭]

বাংলা ভাষায় নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতি বা ব্যঞ্জনাত্বক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির প্রতীক শব্দগুলিই ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শব্দগুলি কে 'বিশেষ এক শ্রেণীর শব্দ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আসলে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাস্তব ধ্বনির ব্যঞ্জনা ও অনুভূতির দ্যোতক। এই ধ্বনি ব্যঞ্জক শব্দগুলি প্রতীকের মাধ্যমে অর্থ বহন করে। যেমন- 'ঝমঝম', 'ছমছম', 'কনকন', 'গনগন', 'ঝর ঝর', 'ছল ছল', 'কল কল', 'টল টল', 'ঢল ঢল', 'বকবক', 'পক পক', 'হর হর', 'গপ গপ' ইত্যাদি। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ গুলি সময় বিশেষে ব্যক্তি, বস্তু, বিষয়, ভাব, ভঙ্গি, ক্রিয়া, কলাকে পৃথকভাবে চিনিয়ে দিতে সহায়তা করে। ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড ধ্বন্যাত্মক শব্দের ভাব প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "Symbolic forms have a connotation of somehow illustrating the meaning more immediately than do ordinary speech forms."[৮]

অর্থাৎ প্রতীকী শব্দগুলি সাধারণ বক্তব্য থেকেও তাতক্ষনিক অর্থ প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

> "যে সকল শব্দ ধ্বনি ব্যঞ্জক, কোন অর্থসূচক ধাতু হইতে যাহাদের উৎপত্তি নহে তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক নাম দেওয়া গেছে; যেমন, ধাঁ সাঁ, চট, খট ইত্যাদি।"[৯]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and development of the Bengali language' গ্রন্থে ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "Onomatopoetics also falls under denominations. These can be classed under two heads- onomatopoeias proper and Roots Reduplicated or

Repeated, which produce a jungle, onomatopoetisk proper can also be either simple or reduplicated."[১০]

তাঁর মতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ দুই প্রকার:

(১) মৌলিক ধ্বন্যাত্মক শব্দ। যেমন- 'চিল্লা (Cilla)', 'চুয়া (Cua)', 'টুপা (Tupa)', 'টুসা (Tusa)', 'বুক (phuk)', 'ফোঁসা (phosa)', 'হাঁক (Hak)', 'হাঁচ (Hach)' ইত্যাদি।

(২) ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিতীকরণ। যেমন- 'কটকটা', 'কড়মড়', 'ক্যাঁচক্যাঁচা', 'খটখটা', 'গড়গড়া', 'পিলপিলা', 'ফরফরা', 'বিড়বিড়া', 'সপসপা' প্রভৃতি।

আবার অর্থগত ও ভাবগত দৃষ্টিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) অনুকারজাত ধ্বন্যাত্মক শব্দ (২) ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

(১) **অনুকারজাত ধ্বন্যাত্মক শব্দ**: অনুকারজাত ধ্বন্যাত্মক শব্দ দুই প্রকার।

(ক) প্রকৃতিগত, যেমন- বৃষ্টি ও জল পড়ার শব্দ, বাতাসের ধ্বনি, বজ্রপাতের ধ্বনি, পশু পাখির ডাক।

(খ) মানব প্রকৃতিগত, যথা- কান্নার ধ্বনি, নৃত্যের ধ্বনি, হাসির ধ্বনি, চলাচলের ধ্বনি প্রভৃতি।

(২) **ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক শব্দ**- শূন্যতা বোধক, পূর্ণতা বোধক, আধিক্য, রাগ ও অভিমান, ভয় ও আশঙ্কা, দুঃখ ও বেদনা, আনন্দ, বর্ণবৈচিত্র্য জ্ঞাপক, ঔজ্জ্বল্য।

বাংলা ভাষায় এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ গুলির প্রয়োগ বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। বাংলা সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ মধ্যযুগ থেকেই কিছু কিছু সাহিত্যে ব্যবহৃত হতো। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতকের লেখক বা কবিয়ালদের লেখায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি লক্ষ করা গেছে। পরবর্তীতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার গল্প উপন্যাসে প্রচলিত হওয়ার পাশাপাশি কিশোর উপন্যাসেও ব্যবহার শুরু হয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পাতাল ঘর উপন্যাসে ধ্বনিবাচক শব্দ হিসেবে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো ঔজ্জ্বল্য, আধিক্য, পূর্ণতা, বর্ণবৈচিত্র্য, ভয় ও আশঙ্কা, দুঃখ ও বেদনা, শূন্যতা, হাস্যধ্বনির তারতম্য বোঝাতে তিনি অনুকার অব্যয় বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন-

ধ্বনিবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত-

"এমনকী একটা রিক্সা ওয়ালা পর্যন্ত চোখ বুজে পঁক পঁক করে হর্ণ দিতে দিতে চলে গেল।" (পৃ-১৮২)

"নোনায় ধরেছে ঝুরঝুর করে চুনবালি খসে পড়ছে।" (পৃ-১৭৮)

ভয় ও আশঙ্কা বোঝাতে-

"দিনের বেলাতেই এলাকাটা যেন ছমছম করে।" (পৃ-১৮৮)

"তবে তার মনটা খচখচ করছিল।" (পৃ-১৯৮)

আধিক্য বোঝাতে-

"বাঁ হাতের পাথরটা দপ করে জ্বলে ওঠে একটা নীল শিখা লকলক করতে লাগল।" (পৃ-২০৪)

"আরও ঘন্টা খানেক বাদে সনাতন মিটমিট করে তাকাতে লাগল।" (পৃ-২০৮)

ঔজ্জ্বল্য বোঝাতে-

"তার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল।" (পৃ-২২০)

"প্রদীপের আলোয় চারদিকটা বেশ ফট ফট করছে।" (পৃ-২২৮)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসের শব্দদ্বৈত বা শব্দজোটের ব্যবহার:

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস নির্মাণের একটি বড় বৈশিষ্ট্য শব্দদ্বৈত বা শব্দজোটের ব্যবহার। শব্দদ্বৈত হল একই শব্দের পরপর দুইবার ব্যবহার। বাংলা ভাষায় কোন কোন পদ বা শব্দ বা অনুকার শব্দ একের অধিক অর্থাৎ পাশাপাশি দুইবার ব্যবহার করলে জোরালো অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় এগুলোকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। সুকুমার সেন এর ভাষায়-

"শব্দদ্বৈত মানে একক শব্দে স্থানে জোড়া শব্দের ব্যবহার"[১১]

অর্থাৎ একক শব্দে স্থানে দুটি শব্দ ব্যবহার করার নামই শব্দদ্বৈত। শব্দদ্বৈত প্রধানত তিন প্রকার-

(১) দ্বিরুক্ত শব্দের শব্দদ্বৈত।

(২) যুগ্ম শব্দের শব্দদ্বৈত।

(৩) পদবিকার বাচক শব্দদ্বৈত।

(১) দ্বিরুক্ত শব্দের শব্দদ্বৈত- একটি বাক্যে যখন কোন একটি শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটে বা পরপর দুইবার ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দ তৈরি করে নতুন অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করে।

(২) যুগ্ম শব্দের শব্দদ্বৈত- বাক্য গঠনের সময় একটি শব্দের সাথে আরেকটি সমার্থক শব্দ বা প্রায় সমার্থক শব্দ বা বিপরীতার্থক শব্দ পাশাপাশি বসে ভাব ব্যক্ত করে তাকে যুগ্ম শব্দদ্বৈত বলে। যুগ্ম শব্দদ্বৈত প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

(১) সমার্থক শব্দদ্বৈত (২) প্রায় সমার্থক এবং (৩) শব্দদ্বৈত বিপরীতার্থক শব্দদ্বৈত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর কিশোর উপন্যাসে প্রচুর শব্দদ্বৈত বা শব্দজটের প্রয়োগ করেছেন। কিশোর উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, বিভিন্ন চরিত্রের বুলিতে এবং নিজস্ব বয়ানে শব্দদ্বৈত বা শব্দজোটের প্রয়োগ করেছেন। এই শব্দদ্বৈত গুলো কখনো বহুত্ব, কখনো তীব্রতা, কখনো প্রবাহমানতা, কখনো আসন্ন অর্থে, কখনো শব্দগত পুনরাবৃত্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে শব্দদ্বৈত বা শব্দ জোটের ব্যবহার:

দীর্ঘ সময় বোঝাতে-

"থাকতেই তো এসেছেন থাকতে থাকতেই জানতে পারবেন।" (পৃ-১৮০)

"কিন্তু আনন্দটা এখন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।" (পৃ-১৮১)

পুনরাবৃত্তি বোঝাতে-

"দেখলুম সব লোক চোখ বুজে হাতড়ে হাতড়ে হাঁটছে।" (পৃ-১৮২)

"সবাই সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে পা ঘষটে ঘষটে হাঁটছে।" (পৃ-১৮২)

"দুবার কোঁক কোঁক শব্দ করে বলে উঠলেন, যে আজ্ঞে।" (পৃ-১৮৯)

বহুত্ব বোঝাতে-

"সেই ছেলেবেলা থেকে সবাই **অপয়া অপয়া** বলে পেছনে লাগত, কেউ মিশতে চাইত না।" (পৃ-১৮৭)

"মাঝে মাঝে রাতচোরা পাখি ডাক, ঝিঁ ঝিঁ র শব্দ, কখনো কুকুরের একটু ঘেউ ঘেউ।" (পৃ-১৯৯)

আসন্ন অর্থে-

"কাজ করছে আন্দাজে আন্দাজে।" (পৃ-২০২)

'পাতাল ঘর' উপন্যাস প্রায় সমার্থক শব্দের ব্যবহার:

শব্দদ্বৈত বা শব্দজোটের পাশাপাশি ঔপন্যাসিকরা তাঁদের আখ্যান নির্মাণে বাক্যের শাব্দিক সৌন্দর্য এবং প্রকাশভঙ্গিতে অভিনবত্ব আনতে প্রায় সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেন। প্রায় সমার্থক শব্দ উপন্যাসে ভাষাশৈলীর অবয়বকে দৃঢ় ও সাবলীল করে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে প্রায় সমার্থক শব্দের প্রয়োগ করে বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন।যথা-

"নাকি গলায় কথা-টথাও বলছিল।" (পৃ-১৭৮)

"কুনো বাড়িতে ভুত-টুত কুছু নাই।" (পৃ-১৭৮)

"শুনে-টুনে জিজ্ঞেস করল, কোন বাড়িটা কিনলেন।" (পৃ-১৮০)

"সকালবেলায় হয়তো অম্বুজবাবুর সঙ্গে ভগবান নিয়ে তর্ক বাধিয়ে প্রমাণ করেই ছাড়ল যে ভগবান-টগবান বলে কিছু নেই।" (পৃ-১৮৭)

"আর দেখো বাতি-টাতি কিছু আছে কিনা।" (পৃ-১৯৬)

উপরের বাক্য গুলিতে ব্যবহৃত 'কথা-টথা', 'ভুত-টুত, 'শুনে-টুনে', 'ভগবান-টগবান', 'বাতি-টাতি', প্রভৃতি শব্দ গুলি প্রায় সমার্থক শব্দ।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে স্ল্যাং শব্দের ব্যবহার:

স্ল্যাং শব্দটি মান্য চলিত ভাষা থেকে কিছুটা বিচ্যুত, অনাচারিক (Informal) পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত, মানব সমাজে প্রচলিত আটপৌরে (Demotic) জাতীয় শব্দ। প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী এম.এ.কে হ্যালিডে এগুলোকে 'Antilanguage' নামে অভিহিত করেছেন। এই স্ল্যাং শব্দের কোনো একক সংজ্ঞা নেই। স্ল্যাং এমন একটি বাগরীতি যা সবসময় অশালীন বা অশ্লীল নয় আবার তথাকথিত ভদ্ররুচি গ্রাহ্যও নয়। স্ল্যাং শব্দ গুলি শোনা অপ্রচলিত অর্থে প্রচলিত শব্দ, বিদেশি শব্দ, নতুন শব্দ, খন্ডিত বা মুন্ডমাল প্রভৃতি শব্দ দ্বারা গঠিত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে আটপৌরে বা স্ল্যাং শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়-

"দ্বিজপদ শুধু খাপ্পা হয়ে বলল, ওরকম একটা জঘন্য, খুনিয়া, গুন্ডা, তেরিয়া, অভদ্র লোক কিনা তেজস্বী!" (পৃ-১৯১)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে অধিবাচন রীতি:

ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রাঙ্গণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অধিবাচন বা সন্দর্ভের ভাষা। এককথায় অধিবাচন হল 'ভাষা প্রয়োগের স্বয়ংসম্পূর্ণ একক'। কোন একটি টেক্সটকে শৈলী বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করার সময় গুরুত্ব দেন অধিবাচনের ভাষার উপর। কারণ সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে অধিবাচন। ভাষাগত কার্যসম্পাদনের মূল একক হল অধিবাচন বা ডিসকোর্স। এই অধিবাচন অনুচ্ছেদ কথোপকথন এবং সাক্ষাৎকারের সময় ও ভাষার বৃহত্তর একক হিসেবে কাজ করে। শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় কোন উপন্যাসের অধিবাচন রীতির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই অনিবার্য হয়ে ওঠে। শৈলীবিজ্ঞানীরা কোন একটা টেক্সটকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রকৃতি অনুসারে রচনার অধিবাচন বা সন্দর্ভকে কয়েকটি কয়েকটি শ্রেণীতে

বিভক্ত করে নেন। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে দুই ধরনের অধিবাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে-

(১) বর্ননা ধর্মী অধিবাচন (২) সংলাপ ধর্মী অধিবাচন

(১) বর্ণনামূলক অধিবাচন:

বর্ণনামূলক অধিবাচনে লেখক কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকের সামনে শব্দময় জগতের ছবি তুলে ধরতে সক্ষম হন। আবার কখনো লেখক আখ্যানের কাহিনি বর্ণনা করার সময় মূল ঘটনা থেকে সরে গিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তৎপর হয়ে ওঠেন। আমরা জানি একজন লেখক কথন শৈলীর মাধ্যমে নির্মাণ করেন তাঁর সাহিত্য। এক্ষেত্রে লেখককে 'কথকের ভুমিকায়' অবতীর্ণ হতে হয়। লেখক নিরপেক্ষ থেকে পাঠককে মূল ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। লেখক স্বয়ং হয়ে ওঠেন 'নামহীন নির্বিশেষ' চরিত্রের প্রতিনিধি। 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে নন্দপুর গ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে দেড়শো বছর পূর্বে নন্দপুরে কি ছিল তার বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন-

> "নন্দপুরের পুবপাড়া যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে ঘোর জঙ্গল, দিনের বেলাতেও জায়গাটা অন্ধকার। দেড়শো বছর আগে একসময়ে এখানে কুখ্যাত তারা তান্ত্রিকের ডেরা ছিল। জনশ্রুতি আছে এখানে নিয়মিত নরবলি হত। জঙ্গলের একেবারে ভেতরে নিবিড় বাঁশবনের মাঝখানে পুরনো পরিত্যক্ত একখানা কালী মন্দির। মন্দিরের বেশিরভাগই ভেঙে পড়েছে। সাপ-খোপ আর তক্ষকের বাসা। বাদুর আর চামচিকের আড্ডা। বহুকাল এই জায়গায় কোনও মানুষ আসেনি। কালী মন্দিরের লাগোয়া পুকুরটাও সংস্কারের অভাবে হেজেমজে গিয়েছিল। তবে মাঝখানটায় এখনও গভীর জল। "(পৃ-২২৪)

(২) সংলাপ ধর্মী অধিবাচন:

যে অধিবাচন রীতিতে চরিত্রেরা নিজেদের মধ্যে সংলাপ আদান-প্রদান করে তাকে সংলাপ ধর্মী অধিবাচন বলে। সংলাপধর্মী অধিবাচন সম্পূর্ণভাবে গল্প, উপন্যাস বা আখ্যানের চরিত্র নির্ভর। শৈলীবিজ্ঞানী জিওফ্রে লীচ উপন্যাস বা আখ্যান উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিন ধরনের সংলাপ রীতির কথা বলেন। যথা-

এক, প্রত্যক্ষ সংলাপ

দুই, পরোক্ষ সংলাপ

তিন, মুক্ত পরোক্ষ সংলাপ

বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষত গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই তিন ধরণের ধরণের সংলাপ রীতিই লক্ষ করা যায়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে এক ধরনের সংলাপ রীতির ব্যবহার রয়েছে। সেটা হল পত্যক্ষ সংলাপ রীতি। প্রত্যক্ষ সংলাপ রীতিতে ঔপন্যাসিক চরিত্রের কথা চরিত্রের বুলিতেই বিবৃত করান। লেখক প্রত্যক্ষ সংলাপের ক্ষেত্রে পূর্বে আলোচিত চরিত্র দুটির নাম উল্লেখ না করে পর পর সংলাপ সাজিয়ে যান। প্রসঙ্গ অনুযায়ী পাঠককে বুঝে নিতে হয় কোনটি কোন্ চরিত্রের সংলাপ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ সংলাপ রীতি ব্যবহারের একটা বিশেষত্ব হলো উদ্ধৃতি চিহ্নের ("........") মধ্য দিয়ে সংলাপের ব্যবহার। তাঁর কিশোর উপন্যাসের সংলাপ প্রয়োগের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল বর্ণনার তুলনায় সংলাপের দৈর্ঘ্য ছোট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রের বুলিতে মুখের ভাষায় বাক্য প্রয়োগ করেছেন। শৈলীবিজ্ঞানী সি.সি অ্যান্ডারসন কিশোর উপন্যাসে শৈলী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

কিশোর উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত হবে তার সঙ্গে সংলাপের দৈর্ঘ্য ছোট হবে। 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সনাতন ও সুবুদ্ধির সংলাপে-

> "সনাতন- আমার নাম সনাতন বিশ্বাস! হ্যাঁ, সেরকম যেন মনে হচ্ছে। আজ এত ভুলভাল হচ্ছে কেন কে জানে! অঘোরবাবুর ওষুধটা খেয়ে ইস্তক মাথাটা গেছে দেখছি। আচ্ছা আমি একটা কলসির মধ্যে শুয়ে আছি কেন বল তো!
> সুবুদ্ধি- কলসি! আগে কলসির মধ্যে শোওয়া কঠিন ব্যাপার। এ হল গে তাকে বলে বাক্স। কফিন ও বলতে পারেন।
> সনাতন- হ্যাঁ বাক্সই বটে বাপের জন্মে কখনও বাক্সে শুয়নি বাপ। এ নিশ্চয়ই এই বিটকেলে অঘোরবাবুর কান্ড।
> সুবুদ্ধি- যে আজ্ঞে।
> সনাতন- এখন রাত কত হলো বল তো!
> সুবুদ্ধি- তা শেষ রাত্রিরই হবে মনে হয়।
> সনাতন- বলিস কী? সেই সকালবেলাটায় ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াল, এর মধ্যেই শেষ রাত্রির। আজব কান্ড।" (পৃ-২০৯)

'পাতাল ঘর' কিশোর উপন্যাসে ভঙ্গি বাচক শব্দের ব্যবহার:

ভঙ্গি হলো একটি বিশেষ রীতি বা প্রণালী। সংজ্ঞাপক কার্য সম্পন্ন করার জন্য একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তির সঙ্গে মুখের ভাষার পাশাপাশি শরীরের ভাষার যে বিশেষ পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করে তাকে ভঙ্গি বলে। যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তির মনের ভাব বুঝে নিতে পারে যে , সে কি বলতে চেয়েছে। যেমন- রাগের ভাব করে কথা বলা, হাসি হাসি ভাব করে কথা বলা, চাপা স্বরে কথা বলা, ভার ভার কণ্ঠে কথা বলা, কাঁদো কাঁদো ভাব করে কথা বলা, গম্ভীর গলায় কথা বলা, কাঁচুমাচু মুখ করে কথা বলা, বিরক্ত হয়ে কথা বলা, মৃদুস্বরে কথা বলা, বিষন্নমুখে কথা বলা প্রভৃতি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মুখাবয়বে ভঙ্গির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সেগুলিকে ভঙ্গি বাচক শব্দ বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। যেমন-

> "নরহরি উদাস হয়ে বললেন, কে জানে কি থাকে!" (পৃ-১৭৭)
> "হরেন গলা চুলকোতে চুলকোতে বলল, পুরনো বললে কিছুই বলা হয়না।" (পৃ-১৮০)
> "সুবুদ্ধি শুকনো মুখে বলল, কোনদিকে তাকানোর কথা বলেছেন।" (পৃ-১৮১)
> "লোকটা ভ্রু কুঁচকে বলল, চোখের রোগ।" (পৃ-১৮৩)
> "সুবুদ্ধি মলিন মুখ করে বলল বড্ড বিপদ যাচ্ছে দাদা।" (পৃ-১৮৪)
> "লোকটা রক্ত-জল-করা চোখে চেয়ে জলদ গম্ভীর স্বরে বলল, বাড়ি যা।" (পৃ-১৯০)

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে সমান্তরালতার ব্যবহার:

বাংলা সাহিত্যের শৈলীগত আলোচনায় একটি বিশেষ দিক হলো সমান্তরলতা বা Parallelism। কবি বা লেখক তাঁদের কবিতা ও উপন্যাসের বাক্য গঠনে সমান্তরলতার ব্যবহার করেন। সমান্তরালতা শব্দটির প্রায়োগিক অর্থ হলো সৌষম্য বা সমগঠন। যা কবিতা বা বয়ানের বাক্যটিতে সমন্বয় ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। যখন কোন কবিতা বা উপন্যাসের বাক্য গঠনে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দুইয়ের অধিক বার বা বারবার পুনরাবর্তিত হয়ে কবিতা বা রচনার মধ্যে বৈচিত্র সৃষ্টি করে তাকে সমান্তলতা বা Parallelism বলে। ভাষাবিজ্ঞানী জিওফ্রে লীচের ভাষায়-

> "In any parallelistic pattern there must be an element of identity and contrast."[১২]

অর্থাৎ কোন গদ্য রচনা একটি বাক্য বা অনুচ্ছেদের দুই বা ততোধিক অংশে ব্যাকরণগত ভাবে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি কে ডঃ শিশির কুমার দাশ সমান্তরালতা আখ্যা দিয়েছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর পাতাল ঘর উপন্যাসে একই ধরনের বাক্যিক উপাদান প্রয়োগ করে গঠনগত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন-

> "ঘাম ঝরে যাচ্ছে, শরীর দুর্বল লাগছে, তেষ্টা পাচ্ছে, এই অবস্থায় হঠাৎ বেশি পরিশ্রম করলে তার দম একেবারেই ফুরিয়ে যাবে।" (পৃ-২০২)
>
> "পয়সা বাঁচছে, সময় বাঁচছে, ঝামেলা বাঁচছে।" (পৃ-২১৩)

উপরের বাক্যগুলোতে শব্দ গুচ্ছের শেষে 'ছ' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি সৌষম্য গঠন করে এবং শ্রুতি মাধুর্য দান করে। যা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গদ্যশৈলীর বিশেষ পরিচায়ক।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে কোড পরিবর্তন রীতির প্রয়োগ:

সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে যখন কোনো একজন ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট উপভাষার বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে তখন তাকে কোড বলে। আবার পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষায় কথা বলে তখন তাকে কোড পরিবর্তন বা কোড সুইচিং বলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে কোড পরিবর্তন বিশেষ দিক পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ-

ভুতনাথ নন্দীর বুলিতে-

> "স্ট্রেঞ্জ থিং।" (পৃ-১৯৬)

উপরের বাক্যটি ইংরেজি বাক্য। এখানে ভুতনাথ নন্দীর বুলিতে লেখক বাংলা বাক্য ব্যবহারের পরিবর্তে ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করেছেন।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে কোড মিশ্রণ রীতির প্রয়োগ:

পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন মানুষের ভাষা ব্যবহারে মধ্যে অন্য ভাষার শব্দ বা বাক্যের আনয়ন ঘটে তখন তাকে কোড মিশ্রন বলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাস থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল।

> "বোধহয় টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।" (পৃ-১৯৫)
>
> "ট্রেসপাসিং হচ্ছে না।" (পৃ-১৯৫)
>
> "জল পাওয়া গেল ভূতনাথের ওয়াটার বটলে।" (পৃ-১৯৬)
>
> "আজ্ঞে, সে তো ইমপ্রেশন।" (পৃ-২২৯)

উপরের বাক্যগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে লেখক বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বাংলা ইংরেজি মিশ্রিত বাক্য প্রয়োগ করেছেন যা লেখকের রচনারীতির বিশেষত্বকে চিহ্নিত করে।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে আন্বয়িক বৈচিত্র

শৈলী আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আন্বয়িক বিচ্যুতি প্রয়োগ ঘটানো। আন্বয়িক বিচ্যুতির (Deviation) কারণে আদর্শ গদ্য থেকে কথ্য ভাষা অনেক সময় আলাদা হয়ে যায়। বাংলা ব্যাকরণে বাক্য গঠনশৈলীর বিচার-বিশ্লেষণে পদ সজ্জার অন্যতম নিয়ম হল- কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া জাতীয় গঠন বৈচিত্র্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষাশৈলীতে এই জাতীয় পদসজ্জার অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটেছে। এটি কাব্যশৈলী প্রধান কারণ হিসেবে বলেছিলেন Jan Mukarovsky। একজন ঔপন্যাসিকের রচনায় কর্তা-কর্ম -ক্রিয়া পদের স্থান

পরিবর্তন তাঁর গদ্য শৈলীর পরিচায়ক। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল ঘর' উপন্যাসের আন্বয়িক বিচ্যুতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'পাতাল ঘর' উপন্যাসের আন্বয়িক বৈচিত্র নিম্নরূপ-

উপন্যাস থেকে গৃহীত বাক্য	আন্বয়িক গঠন
ক) "তার ঘন্টাখানেক পরেই পুরোটা না হলেও খানিকটা বুঝল সুবুদ্ধি।" পৃ-১৮৩	ক) সুবুদ্ধি তার ঘন্টাখানেক পরেই পুরোটা না হলেও খানিকটা বুঝল। পৃ-১৮৩
খ) "আজকাল দু'পয়সা বেশ রোজগারও হচ্ছে আমার।" (পৃ-১৮৪)	খ) আমার আজকাল দু'পয়সা বেশ রোজগারও হচ্ছে। পৃ-১৮৪
গ) "তার মধ্যেই পড়েছিল হারুয়া।" (পৃ-১৯৬)	গ) হারুয়া তার মধ্যেই পড়েছিল পৃ-১৯৬
ঘ) "দরজাটা কোনদিকে খুলবে তাও বুঝতে পারছিল না সে।" (পৃ-২০২)	ঘ) সে দরজাটা কোনদিক খুলবে তাও বুঝতে পারছিল না। পৃ-২০২

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে চিত্রকল্পের ব্যবহার:

বাংলা গদ্য সাহিত্যে চিত্রকল্পের প্রয়োগ স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। ছড়া, কবিতা, গল্প উপন্যাস এর ক্ষেত্রে চিত্রকল্প একটি অতি পরিচিত বিষয়। ইংরেজি ইমেজ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে চিত্রকল্প শব্দটি ব্যবহার করা যায়। ইমেজ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ imago, imitare যা থেকে বাংলা কল্প শব্দটি গৃহীত হয়। এই কল্প শব্দটি কবি বা লেখকের কল্পনাকেই চিহ্নিত করে। কবি বা লেখকের তার কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শব্দ ও বাক্যের জাল বুনে বুনে বিভিন্ন চিত্রকল্প অঙ্কন করেন। শব্দ বা বাক্যের অবয়বে নির্মিত কোন চিত্র বা ছবি যখন কোন লেখকের রচনায় ব্যবহৃত হয়ে পাঠকের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে তখন তাকে সাহিত্যের ভাষায় চিত্রকল্প বলে। সিসিল ডে-লুইস এর ভাষায়-

> "In its simplest term it is a picture made out of words. An epithet or a metaphor simply may create an image; aur and image may be presented to us in a phrase of passage on the face of it purely descriptive. But conveying to our imagination something more than the accurate reflection of an extreme exlity" [১৩]

অর্থাৎ চিত্রকল্প বা ইমেজ হল শব্দ বা বাক্য দিয়ে তৈরি মানুষের মনে জাগরিত হওয়া চিত্র বা ছবি। যে ছবির সাহায্যে একটি রূপক চিত্র অঙ্কন করা যায়। অনেক সময় 'visual imagination' দিয়ে ইমেজ কে আয়ত্ব করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তখন লেখক পাঠককে তাঁর কল্পনার অনুভূতি ভাষার মাধ্যমে 'দৃশ্যানুভূতির' মতোই শ্রবণাভূতি ও স্পর্শানুভূতির অনুভব করান। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসে চিত্রকল্প গুলির উপাদান বিচারে লক্ষ করলে দেখা যাবে গ্রাম ও শহর উভয় কেন্দ্রিক মানুষের জীবন- যাপনের ছবি, ভৌতিক পরিবেশ, বিভিন্ন কাল্পনিক ঘটনা, প্রকৃতি যেমন- নদী, পুকুর, জঙ্গল মহল, পাতাল, বিভিন্ন ঐতিহাসিক জায়গা, পুরোনো বাড়ি, ভিন গ্রহ, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, খেলার মাঠ, প্রভৃতি। তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে ইমেজ বা চিত্রকল্প ব্যবহারের বহুধা বৈচিত্র্য ছবি লক্ষ করা যায়। যেমন-

> "গোবিন্দ বিশ্বাসের বাজার হয়ে যায় একেবারে সাতসকালে। দিনের আলো ফোটবার আগেই যখন নন্দপুরের মানুষজন ঘুম থেকে ওঠেইনি ভালো করে। তা বাজার করার জন্য গোবিন্দ বিশ্বাসের কোন ঝামেলাই নেই, এমনকি বাজারে অব্দি যেতে হয় না। সামনের বারান্দায়

ঝুড়ি, ধামা গামলা সব সাজানো থাকে পরপর। ব্যাপারীরা বাজারে যাওয়ার পথে আলু, বেগুন, পটল, মুলো যখনকার যা সব ঝুড়িতে দিয়ে যায়।" (পৃ-২১৩)

উপরে দৃষ্টান্তে গোবিন্দ বিশ্বাসের বাজার করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে নন্দপুর গ্রামের বাজারে বিভিন্ন চিত্র ছবি আকারে নিখুঁত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

'পাতাল ঘর' উপন্যাসে উপমার ব্যবহার:

উপমা বিষয়টি মানব সমাজের শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় শ্রেণীর কাছেই পরিচিত। যখন কোন একটি বাক্যে দুটি ভিন্ন বিষয় বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয় তখন তাকে উপমা অলংকার বলে। যেমন- "তাঁর মুখখানা দেখতে চাঁদের মতো সুন্দর" এখানে উপমেয় হল মুখ, উপমার হল চাঁদ, আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ হচ্ছে মতো, সাধারণ ধর্ম হল সুন্দর। গল্প-উপন্যাস ও কবিতার মতোই কিশোর উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে উপমার ব্যবহার পাঠকের সামনে এক অনুভূতিময় জগতের উত্তরণ ঘটায়। লেখকের বক্তব্যকে স্পষ্ট রূপদান দিতে উপমার বিকল্প নেই। কারণ লেখক যা দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে না পারে তা উপমার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপমার মধ্য দিয়ে এক বিশেষ প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে যার দ্বারা পাঠকের মনে স্বচ্ছ ধারণা জাগরিত হয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত কিশোর উপন্যাস জুড়ে উপমার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর কিশোর উপন্যাসে চিত্রকল্পের পাশাপাশি উপমা অলংকারের প্রয়োগ কৌশলও আলোচ্য বলে বিবেচিত। উপমা অলংকার নির্মাণে উপমেয়-উপমান ব্যবহার তাঁর কিশোর উপন্যাসের বয়ানে বহু বিচিত্র রূপে উঠে এসেছে। যা তাঁর গদ্য শৈলীতে রূপময়তা দান করে। লেখক তাঁর কিশোর উপন্যাসে প্রকৃতি বাচক, বস্তু ধর্মী প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক, ভাব ব্যঞ্জনাধর্মীমুলক উপমার ব্যবহার করে শৈলীর বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর 'পাতাল ঘর' উপন্যাসে উপামা প্রয়োগের বিভিন্ন দিক গুলো দেখানো যেতে পারে। যেমন-

বস্তুধর্মী উপমা: অপ্রাণিবাচক

"প্রথমে তার মুখে একটা প্রবল ঘুসি মুগুরের মতো এসে পড়ল।" (পৃ-২০০)

"লোকটার শরীরের শক্তি যন্ত্রের মতো।" (পৃ-২২৬)

ভাব বা ব্যঞ্জনাধর্মী উপমা-

"সুবুদ্ধি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'তা তো বটেই।" (পৃ-১৭৮)

"সুবুদ্ধি ক্যাবলাকান্তের মতো বলল, হায়ার করে কেন? (পৃ-১৮৫)

"লোকটা সেলাম ঠুকে বলেছিল 'আপনার মতো মস্তান দেখিনি।" (পৃ-২২৭)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রচলিত ভাষারীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে সতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। 'পাতাল ঘর' উপন্যাস পাঠে দেখা গেছে ইতিবাচক বাক্যের ব্যবহার বেশি যা শিশু-কিশোরদের সহজেই প্রভাবিত করে। আঙ্গিক বিচারেও উপন্যাসটি দীর্ঘ নয়, বয়ানের ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। সেদিক থেকে বলা যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ভাষাশিল্পের সচেতন রূপকার।

টীকা:

আলোচ্য নিবন্ধে উপন্যাস থেকে যতগুলি উদাহরণ নেওয়া হয়েছে সবগুলি 'পাতাল ঘর' কিশোর উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে। মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু। 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র'। তৃতীয় খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। ২০০৯।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার। বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস। ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৮।
২. সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। পৃ. ১৪০।
৩. Leech, Geoffrey. A linguistics guide to English Poetry. Longman, London. 1969, p 10.
৪. মজুমদার, লীলা, বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত)। ছোটদের জন্য বই। দুই দশকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৮১, পৃ. ২৮২।
৫. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ২২২।
৬. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ২৪৫।
৭. দাক্ষী, অলিভা। বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ। সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২।
৮. Bloomfield, L. 'Language' London: George Allen & Unwin Ltd., 1935, P 156.
৯. 'ভাষার ইঙ্গিত'। শব্দতত্ত্ব। 'রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খন্ড'। বিশ্বভারতী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আশ্বিন ১৯৪২, পৃ. ৫৪।
১০. Chatterji, Suniti Kumar. The Origin and development of the Bengali language. Calcutta, 1926, P 889.
১১. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ৫৩।
১২. Leech, GN. ALinguistic guide to English Poetry. Longman London.1969, P 79.
১৩. Day, Lee's. C. The poetic image'. First Publication 1947, Janathan cope 30 Benford square London, P 18.